মোস্তফা আনোয়ার স্বপন

কোয়ান্টাম কমপিউটার

মানুষ যতোবারই নিত্য নতুন কায়দায় প্রাকৃতিক নিয়ম রীতি বিষয়ে অবগত হয়ে ওগুলোকে ব্যবহার করেছে নিজেদের প্রয়োজনে তথা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ততোবারই মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে এসেছে বৈপ্লবিক মোড়। বন্য শিকারী মানুষ যেদিন শিখলো কি করে চাষাবাদ কিংবা পশুপালন করতে হয় সেদিনই তারা গোড়া পত্তন করলো গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজসভ্যতার এবং আরো এগিয়ে নগর সভ্যতার। বাষ্পশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে যেয়ে ঘটিয়ে ফেললো শিল্প বিপ্লব। আর ইলেকট্রনিক কমপিউটার সূচনা করলো যুগান্তকারী তথ্য বিপ্লবের। প্রশ্ন ওঠে, সামনে অমন বড়ো ধরনের কোনো অগ্রগতি ঘটার সম্ভাবনা সত্যিই রয়েছে কিনা। উত্তর হলো– অবশ্যই, বলেছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ ডেভিড ডয়েস। নিশ্চিতভাবেই সে অগ্রগতি হবে আরেকটি বিস্ময়কর গণকযন্ত্রের বৈপ্লবিক আবির্ভাবে–যার নাম কোয়ান্টাম কমপিউটার।

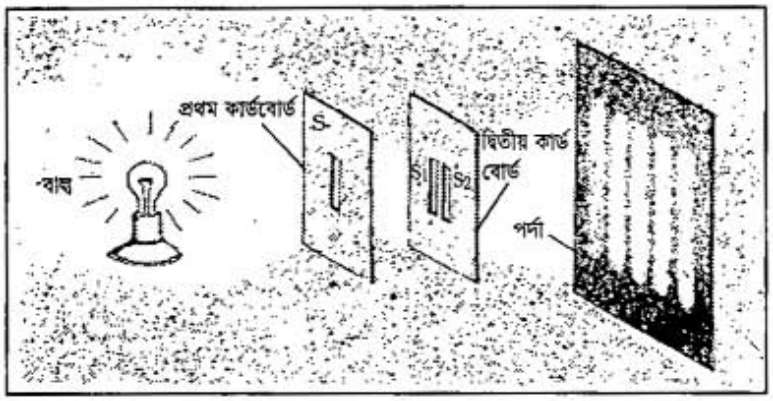

পরমাণু এবং তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর অবপারমাণবিক জগতের ব্যাখ্যা দিতে এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে বল বিজ্ঞানের সূচনা, চিরায়ত নিউটনীয় বলবিজ্ঞানে আপ্তবাক্যের মত স্বীকৃত বাস্তবতার পরমতার প্রত্যয়ের মূলে কুঠারাঘাত করেছে যে বিজ্ঞান, সে হচ্ছে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানে বর্ণিত প্রকৃতিরাজ্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়মকানুনগুলোকে আসলে আমরা এতোকাল আমাদের প্রয়োজনে প্রায় মোটেই খাটাইনি। কুড়িশতকের শেষপ্রান্তে আমরা যে অনবদ্য প্রযুক্তি কমপিউটারকে প্রত্যক্ষ করছি এতো আসলে সেই প্রায় দেড়শ বছর আগেকার চিরায়ত বলবিজ্ঞানের ধারণাকে পুঁজি করে চার্লস ব্যাবেজ উদ্ভাবিত এনালিটিক্যাল ইঞ্জিনেরই প্রজন্মের পর প্রজন্ম পেরোনো অত্যাধুনিক সংস্করণমাত্র। এবার কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়কে খাটিয়ে কোয়ান্টাম কমপিউটার বানানোর পালা।

ধারণার সূত্রপাত ঃ

আশির দশকের গোড়ার দিকে কোয়ান্টাম কমপিউটারের ধারণাটা বিজ্ঞানীদের মনে দানা বাঁধতে শুরু করে। যে হারে ইলেকট্রনিক চিপগুলো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হবার প্রতিযোগিতায় নামে এবং লক্ষ লক্ষ লজিক গেট তথা স্মৃতিকক্ষ ঠাসাঠাসি করে ঢুকতে শুরু করে সমন্বিত বর্তনীর সংকীর্ণ পরিসরে আর তথ্য অদল বদলে যে দুর্দান্ত গতি সঞ্চারিত হতে শুরু করে তা দেখে বিজ্ঞানীরা ভাবতে বসলেন প্রচলিত ধারায় এ কমপিউটার বানানোর শেষ সীমানাটা কী হবে সে নিয়ে। মনে হলো এ হারে সব কিছু চলতে থাকলে একটা সময় আসবে যখন এ কম্পোনেন্টগুলোর এক একটির আকার আকৃতি শেষমেষ দুদশটা পরমাণুর আকারে পর্যবসিত হয়ে যাবে। কথাটা ফলেছে। এইতো গতমাসে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও জাপানী তোশিবা কোম্পানি যৌথভাবে কোয়ান্টাম ইফেক্ট আইসি উদ্ভাবনের ঘোষণা দিলো। একটি চুলের ব্যাসার্ধের এক লক্ষ ভাগের একভাগ পরিমাণ জায়গা নেয় ওই চিপের এক একটি লজিক গেট। অর্থাৎ দশটা পরমাণু পাশাপাশি বসলে যে জায়গা লাগে ততোটুকু। একটা পরমাণু নেয় এক মিলিমিটারের এক কোটিভাগের এক ভাগ জায়গা। কিন্তু, এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুর আকারের স্মৃতি তথা লজিক গেটের কথা যখনই আসে তখনই বাঁধে গোল, কেননা ওই পারমাণবিক জগতে বস্তু মেনে চলে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান। বস্তু যেমন- ইলেকট্রন, তখন একাধারে কণা এবং ঢেউ। পড়ে যাই কোয়ান্টাম ধাঁধায়। কোনো একটি দিকে ইলেকট্রনটির অবস্থান এবং গতিবেগ যুগপৎ নির্ভুলভাবে মেপে নেয়া যায় না। আর যায় না বলেই চিরায়ত ধারণায় এতোদিন যে যৌক্তিক বর্তনীতে ওকে ঘুরিয়েছি সে বর্তনীকে সে থোড়াই কেয়ার করে। ইলেকট্রনের চালচলনকে ওসব বর্তনী নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না– এসে পড়ে অনিশ্চয়তা অনিবার্যভাবেই। এখানে বিজ্ঞানীরা কল্পনা করলেন বাস্তবিকই কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয় ব্যবহার করে কোনো কমপিউটার বানানো যায় কিনা। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজীর প্রয়াত খ্যাতনামা নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যান প্রথম তাত্ত্বিকভাবে দেখাতে সক্ষম হন যে, কোয়ান্টাম কমপিউটারের একটি বিমূর্ত মডেলে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার ঘটনাবলীর অনুরূপায়ণ বা সিমুলেশন সম্ভব।

ফাইনম্যানের মডেলটি ছিলো স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল, চমৎকার। কিন্তু পদার্থবিদ ডয়েসই ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের 'সমান্তরাল বিশ্বের' ধারণাকে খাটিয়ে সব ধরণের প্রয়োগের নিমিত্তে একটি বাস্তব কোয়ান্টাম কমপিউটারকে দাঁড় করেন এবং দেখান যে, এটি দিয়ে এমনসব জটিল কাজ করানো সম্ভব যা প্রচলিত ধারার কোনো কমপিউটারের কাছ থেকে আদায় করা যায় না।

কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান ঃ সমান্তরাল বিশ্ব

আমরা জেনেছি আলোক মূলতঃ ফোটন নামের কতগুলো ছোট ছোট শক্তির প্যাকেট বা কোয়ান্টার সমষ্টি। ফোটনগুলো যে কণা তা নানা ভাবে দেখানো যায়। এখন নীচের ছবিটি দেখুন। ১৮০১ সালে বিজ্ঞানী টমাস ইয়াং এই পরীক্ষাটি করে দেখিয়েছিলেন, আলোক ঢেউয়ের আকারে চলে।

একটি বাল্ব, চিড় বা স্লিট বিশিষ্ট দুটো অস্বচ্ছ কার্ডবোর্ড ও একটি পর্দা, প্রথম কার্ডবোর্ডে একটি স্লিট S। এটিকে একটি মাত্র আলোকরশ্মি তৈরিকারী উৎস (S) বিবেচনা করা যায়। দ্বিতীয় কার্ডবোর্ডে রয়েছে দুটো স্লিট S_1 এবং S_2। প্রথমে কার্ডবোর্ডে S থেকে একটি রশ্মি দ্বিতীয় কার্ড বোর্ডের দুটো স্লিটের ওপর পড়লে পর্দায় দুটো নয় অনেকগুলো খাড়া উজ্জ্বল-অন্ধকার ডোরাকাটা ঝালর দেখা যায়। ছবিতে যেমন দেখানো হলো। কল্পনা করুন অনেকগুলো ফোটন প্রথম কার্ডবোর্ডের S থেকে ছুটছে দ্বিতীয় কার্ডবোর্ডের দিকে। S_1 এবং S_2 গলিয়ে সামনে পর্দায় যে যেখানে পারছে পড়ছে। যেখানে বেশি ফোটন পড়লো সেখানটা উজ্জ্বল, যেখানে ফোটন কম বা একেবারেই পড়লো না সেখানটা অন্ধকার। বোঝা গেলো এ পর্যন্ত। এবার ভাবুন, একটিমাত্র ফোটন S ছেড়ে রওয়ানা হয়েছে। দুটো স্লিটের কোনটি দিয়ে যাবে এটি? পর্দায় ছবিটাই বা কেমন হবে? উত্তর হচ্ছে-যুগপৎ দুটো স্লিট দিয়েই যাবে এবং পর্দায় আগের মতোই ডোরাকাটা আলো-আঁধারের ঝালর। কথাটা মানতে পারছেন না, তাই তো? ফোটনটিকে একটি কণা বিবেচনা করেছিলাম বলেই বেখাপ্পা ঠেকছে যুগপৎ দুটো স্লিট দিয়েই একটি ফোটন কণার যাতায়াতের ব্যাপারটা। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের ধাঁধাটা এখানেই। আসলে, এবার ফোটন আর কণা নয়–ঢেউ। S থেকে ফোটনের সম্ভাবনার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে আর তা পৌঁছুলো স্লিট S_1 এবং S_2 তে। এই S_1 এবং S_2 স্লিটদ্বয়ের ফোকর গলিয়ে তখন দুটো ঢেউ এগোচ্ছে সামনে। পর্দার ওপরে কোনো এক বিন্দুতে দাঁড়ালে টের পাওয়া যাবে দুটো ঢেউই হাজির হচ্ছে ওখানে, একটির উপরে আরেকটি। ঢেউয়ের এই উপরিপাতনের পারিভাষিক নাম ব্যাতিচার বা ইন্টারফেয়ারেন্স। ওই বিন্দুতে পাওয়া যাবে দুটো ঢেউয়ের সম্মিলিত ফল।

ব্যাপারটা ভালো করে বোঝা যাক, পানির ঢেউ নিয়ে ভাবলে সুবিধা হবে। ধরা যাক, পানিতে দুটো ঢিল ফেলা হলো। দুটো থেকেই উঠলো ঢেউ। যেখানে এই দুটো ঢেউ এসে পৌঁছুলো, সেখানে পানির তলের অবস্থা কী রকম হবে? উত্তর হচ্ছে

প্রত্যেকটা টিলের জন্য আলাদাভাবে যতোটা উঠতো পানির তল, সে দুটোকে যোগ দিলে যা হবে, ততোটাই উঠবে দুটো ঢেউয়ের সম্মিলিত প্রয়াসে। এভাবে দুটো ঢেউয়ের উপরিপাতনের অর্থাৎ একসাথে এসে পড়ার ঘটনাকেই বলেছি ব্যাতিচার। এমন যদি হয়, একটি টিলের জন্য কোনো একটা বিন্দুতে একটা বিশেষ মুহূর্তে পানির তল তিন সেন্টিমিটার ওঠার কথা ছিল, অন্যটার জন্য ঠিক তিন সেন্টিমিটার নামার কথা ছিলো, তা হলে দুয়ে মিলে কাটা কাটি হয়ে ঐ জায়গায় পানির তলের ওঠবার পরিমাণ দাঁড়ালো শূন্য। আলোর ঢেউয়ের বেলায় ঠিক এমনটি হলে আলোর পরিমাণ দাঁড়ায় শূন্য। অর্থাৎ অন্ধকার। এটির নাম ধ্বংসাত্মক ব্যাতিচার। আবার কোনো কোনো জায়গায় দুটো ঢেউ একই মুখী হওয়ায় দুয়ে মিলে আলো জোড়ালো হতে পারে, হয়ও। এখানেই তৈরি হয় উজ্জ্বল পাড়। এটিকে বলছি গঠনমূলক ব্যাতিচার। পর্দায় আমরা এই ধ্বংসাত্মক ও গঠনমূলক ব্যাতিচারকেই প্রত্যক্ষ করি অন্ধকার ও উজ্জ্বল ডোরা হিসেবে।

এই পরীক্ষাটি একটি ইলেকট্রন নিয়ে করলেও একই ফল পাওয়া যাবে। ফোটনের মতো ইলেকট্রনও একাধারে কণা এবং ঢেউ এই দ্বৈত সত্ত্বায় আবির্ভূত হয়। সে ক্ষেত্রে বলবো, একটি ইলেকট্রন, যাকে এতোকাল কণা বলে জেনেছি, উৎস S থেকে যাত্রা করে দ্বিতীয় কার্ডবোর্ডের S_1 এবং S_2 স্লিটদ্বয় দিয়ে কোনো এক কৌশলে (বস্তুতঃ ঢেউ রূপে) যুগপৎ গলিয়ে পড়ে সামনে এবং পর্দায় ধ্বংসাত্মক ও গঠনমূলক ব্যাতিচার প্রদর্শণ করে। অনেকভাবেই কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানীরা এ ঘটনাকে উপলব্ধি করেন। তার মধ্যে একটি হলো সমান্তরাল বিশ্বের প্রত্যয়কে আশ্রয় করে।

সমান্তরাল বিশ্বের ধারণায় উপরের পরীক্ষার ইলেকট্রনটির রয়েছে দুটো স্বতন্ত্র সমান্তরাল বিশ্ব এবং যুগপৎ দুটো বিশ্বেরই সে বাসিন্দা। দুটো স্লিট দুটো বিশ্বের দুটো অবস্থা। ধরুন, আমরা যে কোন একটি বিশ্বে আছি। এই প্রথম ধরণের বিশ্বের সাপেক্ষে একটি স্লিট যথা S_1 কে নাম দিতে পারি 'শান্ত অবস্থা' (Ground State)। তাহলে অপর S_2 স্লিটের নাম দিতে হবে 'উত্তেজিত অবস্থা' (Excited State)। তাই বলে আপনি উত্তেজিত হবেন না যেন শুধুমাত্র নামের জন্যই নাম দেয়া। বিপরীত ক্রমেও আমরা বিবেচনায় আনতে পারতাম, তাতে ক্ষতি কিছু হতো না। দ্বিতীয় বিশ্বের সাপেক্ষে কিন্তু S_2 হবে এই বিশ্বের 'শান্ত অবস্থা' আর S_1 হবে তার 'উত্তেজিত অবস্থা'। এবার ধরুন, আমরা কোনো কায়দায় জেনে গেছি, ইলেকট্রনটি S_1 দিয়ে গমন করেছে। তখন প্রথম বিশ্ব দেখবে ইলেকট্রনটি 'শান্ত অবস্থা' দিয়ে গমন করেছে আর দ্বিতীয় বিশ্বের ব্যাখ্যায় ইলেকট্রনটি 'উত্তেজিত অবস্থায়' গমন করেছে বলে প্রতিভাত হবে। তাহলে একটি ইলেকট্রনের একটি ঘটনা বিভিন্ন বিশ্বে বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হচ্ছে। আবার যখন আমরা জানতে পারছি না, ইলেকট্রনটি ঠিক কোন পথে গমন করলো তখন কিন্তু বলতে হচ্ছে ইলেকট্রন যুগপৎ দুটো বিশ্বেই গমন করেছে এবং ফলাফল ব্যাতিচার। এবার স্লিট যদি হয় অসংখ্য তবে সমান্তরাল বিশ্বও হবে অসংখ্য। এভাবে কেবলমাত্র দুটো নয় অসংখ্য সমান্তরাল বিশ্বের প্রত্যয়কে আনা যেতে পারে। ডেভিড ডয়েস ১৯৮৫ সালে তাঁর প্রবন্ধে বলেন, যেমন করে একটি ফোটন বহুপথে একাধারে গমন করতে পারে তেমনি এমন একটি কোয়ান্টাম কমপিউটার পাওয়া যেতে পারে যেটি বহু সমান্তরাল বিশ্বের বহু পথেই একাধারে তার গণনা কাজ করবে। ব্যাপারটা এমন হবে–একটি ছোট্ট কোয়ান্টাম কমপিউটারই অবশেষে প্রচন্ড ক্ষমতাধর প্যারালেল প্রসেসিং সুপার কমপিউটারের মতো আচরণ করবে। এই ভিন্ন ভিন্ন পথে যুগপৎ সম্পাদিত গণনার ফলাফল কিন্তু আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারবো না আলাদা আলাদাভাবে, পাবো সবগুলো বিশ্বে সম্পাদিত গণনার সম্মিলিত বা উপরিপাতিত ফলাফল অর্থাৎ ব্যাতিচার। ডেভিড ডয়েস অপেক্ষায় ছিলেন এমন একটি প্রোগ্রামের যা এই সমান্তরাল বিশ্বে কার্যকর হবে এবং যার থাকবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক উপযোগিতা অথচ যে কাজটি বিদ্যমান প্রচলিত ধারার কোন কমপিউটারই সমাধা করতে পারে না। এ বছর গোড়ার দিকে নিউজার্সির এটি এন্ড টি বেল ল্যাবের প্রোগ্রামার পিটার শোর ঠিক এই এলগোরিদমটিই উপহার দিলেন।

কোয়ান্টাম লজিক গেট ঃ

কোয়ান্টাম কমপিউটার বানাতে ব্যবহৃত হবে পরমাণুর খাঁচায় বন্দী একটি নিঃসঙ্গ ইলেকট্রনকে–যার নাম দেয়া যেতে পারে 'কোয়ান্টাম ডট'। স্বাভাবিক অবস্থায় এটি যে শক্তি নিয়ে থাকবে সে স্তরকে বলবো 'শান্ত অবস্থা'। বোঝাবো '0' দিয়ে। আর একটি নির্দিষ্ট কম্পাংকের লেজার রশ্মিকে একটি নির্ধারিত সময় ধরে ওটির উপর তাক করে রাখলে ওটি শক্তি সংগ্রহ করে উঠে যাবে উচ্চতর শক্তি স্তরে। ওই স্তরকে বলবো 'উত্তেজিত অবস্থা'। বোঝাবো '1' দিয়ে। তাহলে বলা যায়, একটি কোয়ান্টাম ডট দুটো অবস্থা '0' এবং '1' এ থাকতে পারে। দুটো সমান্তরাল বিশ্বে। একটি কোয়ান্টাম ডটই তাহলে একটি স্মৃতিকক্ষ বা রেজিষ্টার যা একটি বিটকে ধারণ করতে পারে। আর ওই যে বললাম, নির্দিষ্ট কম্পাংকের লেজার রশ্মির নির্দিষ্ট সময় ধরে প্রয়োগ করার কথা ওটিকে বলা হবে যৌক্তিক 'NOT' অপারেশন। এ NOT অপারেশন কোয়ান্টাম ডটকে '0' থেকে '1' এ এবং উল্টোভাবে '1' থেকে '0' তে নামিয়ে আনে। এ পর্যন্ত বোঝা গেলো প্রচলিত ধারার কমপিউটারের ব্যবহৃত লজিকগেট সমূহের ধারণা থেকেই। এবার যদি এমন হয়, নির্ধারিত কম্পাংকের লেজার রশ্মি নির্দিষ্ট সময়ের অর্ধেক সময় ধরে প্রয়োগ করা হবে, তাহলে কেমন হবে কোয়ান্টাম ডটের অবস্থা? উত্তর হলো, ঝুলে থাকবে 0 এবং 1 এর মাঝামাঝি। না ঘরকা না ঘটকা। এটি হলো কোয়ান্টাম কমপিউটারে যৌক্তিক অপারেশন $\sqrt{NOT}$। কেননা আর অর্ধেকটা সময় ধরে লেজার রশ্মি চালু থাকলেই তো কোয়ান্টাম ডট অনায়াসে '1' এ পৌঁছে যেতো। তার মানে পেতাম $\sqrt{(NOT)} \times \sqrt{(NOT)} = NOT$। আর এই যে বললাম, $\sqrt{(NOT)}$ প্রয়োগের ফলে ইলেকট্রনটি ঝুলে থাকলো–এর অর্থ হলো ইলেকট্রনটি যুগপৎ '0' অবস্থায়ও আছে '1' অবস্থায়ও আছে। শান্ত এবং উত্তেজিত দুটো সমান্তরাল বিশ্বেই। অর্থাৎ দুটো বিশ্বের উপরিপাতন। ফলাফল-নির্ঘাত ব্যাতিচার। এভাবেই কোয়ান্টাম কমপিউটার রূপ সৌধের প্রথম ইষ্টক আমাদের হস্তগত হলো। এই কোয়ান্টাম ডট তথা এক বিট স্মৃতিতে তাহলে এখন কেবলমাত্র একটি বিট সংরক্ষিত নয় বরং বলা ভালো ধারণ করতে পারে সম্ভাব্য এমন সব বিট মানে দুটো বিটই সমুপস্থিত। গাণনা কার্যও চলবে যুগপৎ দুটো সমান্তরাল বিশ্বে। এবার প্রথম কোয়ান্টাম ডট এর পাশে দ্বিতীয় একটি কোয়ান্টাম ডটকে স্থাপন করি। আর এভাবে যুগল বন্দী করি, প্রথমটির ওপরে NOT অপারেশন কার্যকর হবে না যদি দ্বিতীয়টি '1' অবস্থায় না থাকে। অর্থাৎ NOT অপারেশনে শর্তারোপ করে পেলাম নিয়ন্ত্রিত বা কন্ট্রোলড্ নট CNOT। আগেকার মতোই এই CONT থেকে পাওয়া যাবে আরেক কোয়ান্টাম লজিক অপারেশন $\sqrt{(CNOT)}$। এই $\sqrt{(CNOT)}$ হলো আমাদের হাতে আসা আরেকখানা ইট। এভাবে কোয়ান্টাম কমপিউটারের সবগুলো লজিক গেট সংগঠিত করা যায়। লক্ষ্য করুন, এই $\sqrt{}$ ধরনের লজিক অপারেশনের যে প্রত্যয় এর কোনো সরাসরি সাদৃশ্য প্রচলিত ধারার কমপিউটারের লজিক গেটে নেই। এখানেই অভিনবত্ব। এই $\sqrt{}$বর্গমূল ধরনের লজিক অপারেশনের ফলে এখন একটি রেজিষ্টার এক মুহূর্তে একটিই মাত্র তথ্যকে ধারণ না করে বরং ওই রেজিষ্টার ধারণ করতে পারতো এরকম সম্ভাব্য সবগুলো সংখ্যাকেই উপরিপাতিত অবস্থায় গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যুগপৎ বিবেচনায় রাখে। উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট হবে। একটি দুই-বিট রেজিষ্টারের কথা ভাবুন। প্রচলিত ধারায় এমন রেজিষ্টার 0 এবং 1 দিয়ে প্রকাশিত সম্ভাব্য চারটি সংখ্যার যে কোন একটি দুই অংক বিশিষ্ট সংখ্যাকে এক মুহূর্তে জমা রাখতে পারে। $\sqrt{(NOT)}$ অপারেশন প্রয়োগে এই রেজিষ্টারটিই এখন একাধারে চারটি সখ্যাকেই গণনার সময় হাজির রাখছে। 00(বাইনারী শূন্য), 01 (বাইনারী এক), 10 (বাইনারী দুই) এবং 11 (বাইনারী তিন)। চারটি সমান্তরাল বিশ্ব। তবে উপরিপাতিত। একটি পূর্ণাঙ্গ কমপিউটার বানাতে লক্ষাধিক কোয়ান্টাম ডটকে একটি চিপের ওপর তৈরি করতে হবে। নিবন্ধের শুরুতেই বলেছি হিতাচী, তোশিবা, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়সহ মার্কিন বেশকতক প্রতিষ্ঠান একাজে প্রাথমিক যে অগ্রগতি ইতোমধ্যেই সাধন করছে তা এক কথায় অভাবনীয়।

পিটার শোর এর এলগোরিদম ঃ

এবার দেখবো পিটার শোর উদ্ভাবিত এলগোরিদমটি কি, কোন কাজে, কী কায়দায় কোয়ান্টাম কমপিউটারে কার্যকর হয়। এসবের আগে সমস্যা চেনা দরকার। সরকার, সসস্ত্র বাহিনী আর ব্যাংক সমূহের লেনদেনের তথ্য গোপন করার পদ্ধতি হচ্ছে ম্যাচাচুসেটস ইনষ্টিটিউটের রোনাল্ড রিভেষ্ট, আদি শামির এবং লেনার্ড আদেলম্যান উদ্ভাবিত RSA পদ্ধতি। দুটো বড়ো মৌলিক সংখ্যার গুনফল বের করা যতো সহজ বিপুল সংখ্যক অংকের একটি সংখ্যাকে তার মৌলিক উৎপাদকে ভেঙ্গে ফেলা মোটেই ততো সহজ নয়। সংখ্যাতত্ত্বের এই সত্যকে আশ্রয় করেই উপরোক্ত তিন উদ্ভাবক RSA-129 পদ্ধতিতে ১৯৭৭ সালে এমন একটি প্রোগ্রাম লেখেন যে প্রোগ্রামকে ভেদ করতে হলে কমপিউটারকে একশ উনত্রিশ অংকের এক বিরাট সংখ্যাকে তার মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হয়। এ বছর গোড়ার দিক নাগাদ এটি ছিলো এক দুর্ভেদ্য দেয়াল। এ বছর অবশেষে একালের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ষোলশ কমপিউটারের ইন্টারনেটে যুক্ত

থেকে তাদের সমস্ত শক্তি খাটিয়ে ওই প্রোগ্রামকে দুমড়ে মুচড়ে দিতে সময় লেগেছে টানা আটমাস। এর পরেও প্রোগ্রামারগণ হাল ছাড়লেন না। জানালেন, একশ উনত্রিশটি কেবল নয় আরো বহুঅংক জুড়ে দিয়ে পরিস্থিতিকে ভয়ংকর করে তুলতে এখনো তারা সক্ষম। কিন্তু না, পিটার শোর সে আশার গুড়ে বালি দিয়ে দিলেন। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো হাজির হলো পিটার শোর উদ্ভাবিত এলগোরিদম। তিনি বলেন, আধুনিক পিসির সমান গতিশীল একটি কোয়ান্টাম কমপিউটারের পক্ষেই তার এলগোরিদম ব্যবহার করে ওই একশত উনত্রিশ অংকের বিশাল সংখ্যাটিকে এটির মৌলিক উৎপাদকে ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব মাত্র কয়েক সেকেন্ডে। সংখ্যা যতো বড়োই হোক তাতে কিছু যায় আসে না–আর গতিশীলতা যদি হয় আরো বেশি তবে তো কথাই নেই।

ডেভিড ডয়েস দেখেছেন, এক থেকে আট এর মধ্যবর্তী একটি সংখ্যাকে ভাঙতে দরকার কুড়িটি কোয়ান্টাম ডট এর রেজিষ্টার। তার RSA-129 এর বিশেষ সংখ্যাটিকে তারা মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লিষ্ট করতে লাগবে বড়োজোর হাজার দুয়েক কোয়ান্টাম ডট।

ওহো! এতো কথার ফাঁকে আমি ভুলেই গেছি পিটার শোর-এর বিস্ময়কর এলগোরিদমটির কথা। এলগোরিদমটি বস্তুতঃ সংখ্যাতত্ত্বের জটিল ঘুরপাকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেও আমরা সে আলোচনার ধারে কাছেও ঘেঁষবো না। বরং চেষ্টা করি সহজে কিছু বোঝা যায় কিনা। এটিকে তিনটি ধাপে দেখা যায়। আমরা N যেমন ১৫ কে তার মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে চাই। প্রথম ধাপ আগেই বলা হয়ে গেছে। এখানে একটি রেজিষ্টারকে √(NOT) প্রয়োগে উপরিপাতিত বিশ্বে নিয়ে যাওয়া হয়। উদাহরণ দিয়েছিলাম কেমন করে দুই বিট রেজিষ্টারে √(NOT) প্রয়োগে চারটি সমান্তরাল বিশ্ব সৃষ্টি করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে 0 থেকে ১৫এর মধ্যবর্তী যে কোন একটি সংখ্যা x বেছে নিই। ধরুন x=২। দুইকে তার বিভিন্ন শক্তিতে উন্নীত করি। তাহলে পাবো ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২,. . . . . ইত্যাদি। এগুলোকে ১৫ দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষগুলোকে দ্বিতীয় রেজিষ্টারে জমা রাখি। ভাগশেষগুলো পাবো ২, ৪, ৮, ১, ২, ৪, ৮, ১, ২, ৪, ৮, ১, ... এরকম। লক্ষ করুন ২, ৪, ৮, এবং ১ এইচারটি সংখ্যার পুনরাবৃত্তিক একটি ধারা পাওয়া যাচ্ছে। কটি সংখ্যা ঘুরে ফিরে আসছে? চারটি। তাহলে বলবো ফ্রিকোয়েন্সী f=৪। দ্বিতীয় ধাপ এ পর্যন্তই। তৃতীয় এবং শেষ ধাপটি বেশ জটিল। সমান্তরাল বিশ্বের বেশ কয়েকদফা উপরিপাতন এবং কয়েকধাপ কোয়ান্টাম লজিক অপারেশন শেষে কাঙ্ক্ষিত মৌলিক উৎপাদকটি যা পাওয়া যাবে তাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাবে এভাবে $x^f/2-১$। আমাদের উদাহরণে x=২ f=৪। তাহলে $২^৪/২-১ = ৩$। ব্যাস, এইটিই ১৫ এর একটি মৌলিক উৎপাদক। সবসময় অবশ্য এ পদ্ধতিতে সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে মৌলিক উৎপাদকটি আসে অন্য একটি সংখ্যার সাথে গুণ হয়ে। সেক্ষেত্রে নতুন করে x বাছাই করে উপরের প্রক্রিয়াটি আবার সম্পন্ন করতে হবে। মজার ব্যাপার হলো, যে যে সংখ্যাগুলো আমাদের কাঙ্খিত উত্তরটিকে উগরে দেবে কেবলমাত্র তারাই সমান্তরাল বিশ্বে গঠনমূলক ব্যাতিচার সৃষ্টি করে। যেহেতু, কোয়ান্টাম কমপিউটার গোটা প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন করে সেহেতু মাত্র কয়েকবার এ কায়দায় চেষ্টা করলেই উত্তর পাওয়া যাবে। একশ উনত্রিশ অংক কেন আরো শত শত অংক বিশিষ্ট সংখ্যাকেও একায়দায় ভাঙতে সময় লাগবে মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

শেষ কথা ঃ

এ মুহূর্তে এটা স্পষ্ট মনে হচ্ছে, নয়া শতাব্দীর আগমন বার্তার সাথে নয়া প্রাযুক্তিক বিপ্লবের কর্ণধার হবার আকাংখা তারস্বরে জানান দিচ্ছে কোয়ান্টাম কমপিউটার তার স্বকীয় কর্মপ্রক্রিয়ার স্বাতন্ত্রে। প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে মাত্র। এ অবস্থায় সমস্যা কিছু থাকছেই। বলাবাহুল্য, সমস্যাগুলো টেকনিক্যাল। প্রথম সমস্যা স্বল্পপরিসরে বিশুদ্ধ, অবিচল, কোয়ান্টাম ডট উৎপাদন সংক্রান্ত। আর দ্বিতীয়টি লেজার প্রযুক্তির বিপুল উন্নয়নের সাথে জড়িত। প্রথম ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, আগেই বলেছি। আর লেজার প্রযুক্তিতে ও দ্রুত উন্নয়নের ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কোয়ান্টাম কমপিউটারের বিরুদ্ধবাদীও আছেন অনেক। নিউইয়র্কের আই বি এম রিসার্চ সেন্টারের রক্ষ ল্যান্ডার এদের অন্যতম। তিনি (noise) নয়েজ জনিত ত্রুটি বিচ্যুতির কথা প্রায়ই তোলেন। এ ব্যাপারে ডয়েসের বক্তব্য সোজা। তিনি বলেন, এই কমপিউটারটি যদি সময়ের শতকরা দশমিক একভাগ সময়ও ঠিক ঠাক কাজ করে তবে পিটার শোর উদ্ভাবিত এলগোরিদমটি একবার সম্পন্ন হয় এতোই দ্রুত যে এটি এক হাজার বারও যদি চালানো হয় তবে অন্তত একবার সঠিক উত্তরটি হাজির করবেই। আর তাতে সময় লাগবে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। উত্তর যাচাই করা খুব সোজা, সঠিক উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত চালিয়ে রাখা যাবে। যা হোক, নয়েজ সংক্রান্ত সমস্যা আপাতত থাকছে ডেভিড ডয়েস এবং তার আরো দুই সহযোগী অক্সফোর্ডের আর্থার একার্ট ও আদ্রিয়ানো বারেঙ্কো বেশ কতক সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। তারা চার্লস ব্যাবেজের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এনালিটিক্যাল ইঞ্জিনেরই মতো শুনতে অনেকটা নতুন কোয়ান্টাম কমপিউটারের নাম রাখলেন ফ্যাক্টরাইজিং ইঞ্জিন। কী হবে এর কাজ? মনে হচ্ছে তথ্য গোপনকারী একদা অভেদ্য বিবেচিত প্রোগ্রামগুলোর বারোটা বাজানো ছাড়াও আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান হয়তো এটি দিতে পারবে। বিজ্ঞানীদের বহুকালের স্বপ্ন অথচ পর্বত প্রতীম হয়ে বিরাজমান আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও চলমান জলবায়ু সংক্রান্ত সমস্যার সুরাহা করা। কেননা এসব ক্ষেত্রে বিশাল বিশাল সংখ্যাকে ভেঙ্গে চুরে দেয়া প্রয়োজন। আর কোনো প্রয়োগ? এ উত্তর দেয়ার আগে স্মরণ করিয়ে দিই, চার্লস ব্যাবেজকেও যদি তাঁর এনালিটিক্যাল ইঞ্জিন বিষয়ে প্রশ্ন করা হতো তিনি বলতেন, নিঃসন্দেহে আমরা খুব সহজেই লগারিদম ছক বানাতে পারবো। অথচ এখন আমরা জানি গোটা বিংশ শতব্দীতে তথ্য বিপ্লব ঘটিয়ে কমপিউটার কী কান্ডই না করছে। এটা ওই সময়ে কারো পক্ষে কল্পনা করাটাও ছিলো অসম্ভব। সুতরাং কোয়ান্টাম কমপিউটার ফ্যাক্টরাইজিং ইঞ্জিন মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে কোন অবদান রাখবে সে প্রশ্নের উত্তর দেবার গুরুদায়িত্ব চাপালাম আগামী সময়ের কাঁধে। শেষ কথা বলা হলো না।*

সুপার হাইওয়ে

(৩১ নং পৃষ্ঠার পর)

সিংগাপুর টেলিকম, এটিএন্ডটি এবং জাপানী কোকুশাই ডেনশিন ডেনওয়া এখন যৌথভাবে এই নির্মিতব্য ইন্টার‍্যাকটিভ সুপারহাইওয়ের জন্য বিশ্বব্যাপী কার্যধারার একটা অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের স্ট্যান্ডার্ড বেঁধে দেয়ার চেষ্টা করছে এবং সে লক্ষ্যে এবছর মে মাসে ওয়ার্ল্ড পার্টনার্স কোম্পানি নামের একটি কনসোর্টিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের ব্যবসায়িক ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল ও মসৃন করার স্বার্থেই এমন একটি অভিন্ন মানকে আগ্রহভরে গ্রহণ করছে। অন-লাইন সেবাগ্রহণকারী ইচ্ছে করলে উপরোক্ত কোম্পানি তিনটির যে কোনোটি থেকে এককভাবে সেবাগ্রহণের চুক্তিবদ্ধলেও অসুবিধা নেই, অপরাপর দুটি কোম্পানি কর্তৃকপ্রদত্ত সেবাও তারা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করতে পারবেন।

বিশ্বের টেলিযোগাযোগ তথা অন-লাইন তথ্যসেবার ক্ষেত্রে একটি অত্যাধুনিক, উচ্চতর মাল্টিমিডিয়া সুপার হাইওয়ের প্রতিষ্ঠা ও একক অভিন্ন আন্তর্জাতিকমান নির্ধারন প্রক্রিয়ার খবর আমাদের আধুনিক প্রযুক্তি ও কমপিউটার বিমুখ টিএন্ডটির আমলারা জানেন কিনা জানিনা, তবে সবচেয়ে উঃ খবরটি হচ্ছে এই ওয়ার্ল্ড পার্টনার্স গ্রুপের সদস্য হওয়ার জন্যে ইতোমধ্যেই ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা ও এশিয়ার প্রসিদ্ধ প্রায় ছয়টি টেলিযোগযোগ কোম্পানি আলাপ আলোচনা শুরু করেছে।

আদনান মারুফ

ইন্টারনেট - হাতের মুঠোয়

(১৮ নং পৃষ্ঠার পর)

কমপিউটারে পাঠিয়ে দেবে। তখন বিশেষভাবে তৈরী সফটওয়্যার একটা ড্রাফট ডকুমেন্ট তৈরী করবে। একজন আইনজ্ঞ ডকুমেন্টটা নিরীক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে মক্কেলের কাছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবে। আইন প্রতিষ্ঠানটির একজন কর্মকর্তার মতে প্রযুক্তির এই নবতর প্রয়োগ লিগ্যাল সার্ভিস দেয়ার জন্য অত্যাবশকীয় হয়ে উঠছে।

সবাই যে ইন্টারনেটকে পূর্ণোদ্যমে ব্যবহার করছে তা-ও নয়। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান পরীক্ষামূলকভাবে তাদের কোম্পানি বা পণ্য সম্পর্কে কিছু তথ্য ইন্টারনেটের গ্রাহকদের জন্য তুলে ধরছে। আইবিএম তাদের থিংক ম্যাগাজিনের ইলেকট্রনিক্স সংস্করন প্রচার করছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এই ইলেকট্রনিক ম্যাগাজিন আইবিএম কোম্পানি, তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী এবং রিসার্চ কর্মকান্ড সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যে সাজানো।

ইতোমধ্যেই বিশ্বের ৭৫টি দেশে ইন্টারনেটের পূর্ণাঙ্গ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরো ৭৭টি দেশের কমপিউটার ব্যবহারকারীরা প্রাথমিক পর্যায়ের ইন্টারনেট যোগাযোগ সুবিধা লাভ করছেন। অথচ আমাদের বাংলাদেশে এখনও ইন্টারনেট দূরের কথা ই-মেইল এর প্রাথমিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলারও কোন সরকারী উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্বউদ্যোগে ই-মেইল ব্যবস্থা চালু করেছে। আমাদের সরকার ও নেতৃবৃন্দের বোঝা দরকার কূপমন্ডুকতায় ডুবে না থেকে আমাদের প্রয়োজন উন্নত পৃথিবীর সর্বশেষ প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হওয়া। প্রযুক্তির আশীর্বাদ না পেলে আজকের চরম প্রতিযোগিতামূলক পৃথিবীতে উন্নয়ন কিছুতেই সম্ভব নয়। *